শাউয়াল মাসের করণীয় বর্জনীয়

আরবী বছর বা হিজরী বছর অনুযায়ী রমাযান মাসের পরের মাস হলো শাউয়াল মাস। এই মাসকে "শাউয়ালুল মুকাররম" বলা হয়। এই মাসে আমলের সাথে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

প্রথম আমলঃ ঈদ পালন করা

ঈদের রাত্রের ফযীলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে তার অন্তর সেই দিনও মৃত্যু বরণ করবে না যে দিন সকলের অন্তর মৃতপ্রায় হয়ে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং-১৭৮২)

ঈদের আমলের বিস্তারিত বিবরণ যিলহাজ্জ মাসের করণীয় বর্জনীয়তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই ঈদ-যাপন নিয়ে আমাদের মাঝে একটি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তা নিরশনে নিম্নে কিছু আলোচনা করা হলোঃ

সারা বিশ্বে একইদিনে রোযা ও ঈদ

শরীয়ত কী বলে?

সম্প্রতি কিছু লোক সারা বিশ্বে একইদিনে রোযা শুরু ও একই দিনে ঈদ উদযাপন নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করছে। আমাদের দেশের কিছু এলাকায় সৌদিআরবকে মডেল বানিয়ে সৌদিআরবের সাথে মিলিয়ে রোযা ও ঈদ পালনও শুরু করেছে। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো, 'হানাফী মাযহাবেই সারা বিশ্বে এই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করতে বলা হয়েছে'। অথচ কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও হানাফী মাযহাবের আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, সারা বিশ্বে একদিনে রোযা ও ঈদ শুরু করা শরীয়াতের চাহিদা নয় । বরং প্রত্যেক দূরবর্তী এলাকার লোকজন নিজের এলাকার চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ শুরু করাই শরীয়াতের হুকুম। নিম্নে এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ফিকহে হানাফীর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো যাতে বিভ্রান্তির নিরসন হয় এবং সত্য প্রেমিরা পথ খুঁজে পায়।

এ ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

'সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই রমযান মাস পাবে সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে।' (সূরা বাকারা: ১৮৫)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যে অঞ্চলের লোকেরা যখন চাঁদ দেখবে তখন তারা রোযা শুরু করবে। এখানে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করতে বলা হয়নি।

সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: يسئلونك عن الاهلة 'লোকেরা আপনার কাছে নতুন মাসের চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে...' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন চাঁদের রহস্য কী? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রোযা শুরু করা ও রোযা খতম করার সময় নির্ধারণী হিসেবে নতুন চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৪৮৮)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই আয়াতে চাঁদ বুঝানোর জন্য هلال শব্দের বহুবচন الاهلة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ নতুন চাঁদসমূহ। এখানে বহুবচন ব্যবহার করাই হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, মাতলা বা উদয়স্থলের ভিন্নতার ভিত্তিতে রোযা ফরয হওয়ার বিধান জারী হবে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হেলাল তথা নতুন চাঁদের ভিত্তিতে ভিন্নভিন্ন উদয়স্থলের লোকদের উপর রোযা ফরয হবে। আর কুরআনের যেখানে শব্দের মধ্যে ব্যাপকতা থাকে তা শানে নুযূল তথা অবতীর্ণের উৎস মূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। (বিস্তারিত জানতে দেখুন মাবাহেস ফী উলূমিল কুরআন পৃ.৭৮ শায়েখ মান্না কাত্তা)

এ ব্যাপারে সুন্নাহর ভাষ্য:

১. হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু কর, আবার চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদুল ফিতর) করো, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করো।' (সহীহ বুখারী হা.নং১০৯০, মুসলিম হা.নং ২৫৬৭)

এই হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকু বুঝে আসে যে, চাঁদ দেখে রোযা রাখতে হবে, আবার চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়তে হবে। কাছের এলাকা বা শহর থেকে যদি চাঁদ দেখার সংবাদ আসে তা গ্রহণ করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে এই হাদীসে কোনো নির্দেশনা নেই। কিন্তু অপর এক হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যদি নিকটবর্তী কোনো এলাকা থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ আসে তাহলে নিজেরা চাঁদ না দেখলেও তা গ্রহণ করা হবে।

যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, গ্রামে বসবাসকারী জনৈক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমি গত রাতে রমযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্যপ্রদান

কর যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই? লোকটি বলল হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? লোকটি উত্তর দিল হ্যাঁ। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলাল রাযি.কে লক্ষ্য করে বললেন, হে বেলাল! তুমি লোকদেরকে জানিয়ে দাও তারা যেন আগামী দিন থেকে রোযা রাখা শুরু করে। (আবূ দাউদ হা.নং ৬৯১, নাসায়ী হা.নং২১১২)

বর্ণিত হাদীসে আগত ব্যক্তি শহরের বাহির থেকে এসে চাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণও করেছেন। এর দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, নিজেরা চাঁদ না দেখলেও কাছের এলাকার বা শহরের কারো দ্বারা চাঁদ দেখা প্রামাণিত হলেও রোযা রাখা ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ এলে বা সেখানের আমীর কর্তৃক চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালার খবর এলে তা গ্রহণ করা হবে কিনা? সে ব্যাপারে অপর একটি হাদীসে নির্দেশনা পাওয়া যায়।

'কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত, উম্মুল ফযল বিনতে হারেস তাকে সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কাছে পাঠালেন (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকা অবস্থায় জুমআর রাতে রমযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমার নিকট কিছু প্রশ্ন করলেন এবং নতুন চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কোন দিন নতুন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম জুমআর রাতে চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি নিজে দেখেছ? আমি বললাম হ্যাঁ, আর লোকেরাও দেখেছে এবং তারা রোযাও রেখেছে, মুআবিয়া রাযি.ও রোযা রেখেছেন। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি এবং সেই হিসাবেই আমরা শেষ পর্যন্ত রোযা থাকবো, অর্থাৎ চাঁদ না দেখা গেলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা ২৯ তারিখে নিজেরাই চাঁদ দেখব। আমি বললাম, মুআবিয়া রাযি. এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম হা.নং১০৮৭, মুসনাদে আহমাদ হা.নং২৭৮৯, আবূ দাউদ হা.নং২৩৩২, তিরমিযী হা.নং ৬৯৩)

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝে আসছে যে, যদি চাঁদ দেখার স্থান দূরবর্তী হয়, তাহলে সেখানের চাঁদ দেখা অন্যদের জন্য যথেষ্ট হবে না। কারণ কুরাইব বিন আবী মুসলিম (মৃত: ৯৮হি.) একজন তাবেঈ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং ইবনে আব্বাস রাযি. এর অতিঘনিষ্ট জন। আর ইবনে আব্বাস রাযি. এর নিকট রমযান সম্পর্কে এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর কুরাইব শুধু নিজের চাঁদ দেখার সংবাদ দেননি বরং তখনকার আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কাছে চাঁদ দেখা প্রামাণিত ও কার্যকর হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং তার সংবাদের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস রাযি. এর কাছে চাঁদ দেখার এই সংবাদ গ্রহণ করতে কোনো বাধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও ইবনে আব্বাসে রযি. এর নিকট সিরিয়া দূরবর্তী এলাকা গণ্য হওয়ায় তিনি সে সংবাদ গ্রহণ করলেন না বরং বলে দিলেন : هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমনই আদেশ করেছেন'

এ কথা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ইবনে আব্বাস রাযি.এর মাযহাব এটাই ছিল যে, দূরবর্তী এলাকায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা ফরয হবে না। হতে পারে ইবনে আব্বাস রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী 'চাঁদ দেখে রোযা রাখো ও চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো' এর উপর তার মাযহাবের ভিত্তি রেখেছেন। অথবা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন আদেশে আদিষ্ট হয়ে এ কথা বলেছেন।

উম্মতের ইজমা: দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা তথা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম আবূ বকর আল-জাসসাস আহকামুল কুরআনে লিখেন: 'আর এ ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দূরবর্তী অঞ্চলের প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে অন্যের দেখার অপেক্ষা করা ছাড়াই।' (আহকামুল কুরআন:১/৩০৫)

ইমাম জাসসাস রহ. এখানে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন যে, দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। যদিও এর ব্যাখ্যায় তিনি ভিন্ন ক্ষেত্রের কথা বলেছেন। কিন্তু মূল বিষয়টির ব্যাপারে ইজমার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. মুআত্তা মালেকের ভাষ্য গ্রন্থ 'আল ইসতিযকার'-এ লিখেছেন: 'এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দূরবর্তী শহর যেমন খোরাসান থেকে স্পেন, এমন ক্ষেত্রে এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রূপ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য, তবে বড় শহর হলে বা চাঁদের উদয়স্থল কাছাকাছি হলে এমন শহরের কথা ভিন্ন। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী এলাকার চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। (ইসতিযকার:৩/২৮৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম ইবনে আব্দুল বারের পূর্বোক্ত ইজমার কথা উল্লেখ করে দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি লিখেছেন: ' ইবনে আব্দুল বার উল্লেখ করেছেন, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এই মতানৈক্য ঐ সব এলাকার ক্ষেত্রে যেসব এলাকার চাঁদের উদয়স্থল এক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যেসব এলাকা দূরবর্তী যেমন খোরাসান ও স্পেন এসব এলাকার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, এমন দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য নয়।' এ কথা উল্লেখ করার কিছু পরেই

তিনি এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মাযহাব বর্ণনা করে লিখেছেন: 'দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য না হওয়ার যে ইজমা ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন তা ইমাম আহমাদ রহ. এর দলীলের খেলাফ না।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া : ২৫/১০৩, ১৩/৬২)

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে লিখেছেন: 'ইবনে আব্দুল বার রহ. দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না মর্মে ইজমা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, উলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য যথেষ্ট নয়।' (ফাতহুল বারী: ৪/১৫৫)

ইমাম ইবনে রুশদ বেদায়াতুল মুজতাহিদ কিতাবে লিখেছেন: 'এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দূর দেশের ক্ষেত্রে এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য হবে না। যেমন: স্পেন ও হেজাজ।' (বেদায়াতুল মুজতাহিদ নেহায়াতুল মুকতাসিদ:২/৫০)

আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী মাআরেফুস সুনানে লিখেছেন: 'শাইখ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, ইমাম যায়লায়ীর কথার উপর আমার সিদ্ধান্ত স্থির ছিল। পরে কাওয়ায়েদে ইবনে রুশদ কিতাবে এ ব্যাপারে ইজমার বর্ণনা পেয়েছি যে, দূরবর্তী স্থান হলে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হবে। আর কতটুকু দূরকে দূর বলে ধরা হবে তা অবস্থার শিকার ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিবে, তার নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত নেই।' (মাআরিফুস সুনান: ৫/৩৪০)

তবে এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হলো, যে দুই দেশে বা এলাকার চাঁদ দেখার তারিখ সব সময় একই হয় সে দুই দেশকে নিকটবর্তী এলাকা গণ্য করা হবে। যে সব এলাকার মধ্যে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাধারণত একদিন বা ততোধিক দিনের পার্থক্য থাকে সেসব এলাকাকে দূরবর্তী শহর বা এলাকা গণ্য করা হবে। (ফাতহুল মুলহিম: ৩/১১৩, কিতাবুল মাজমূ : ৬/১৮৩)

আরব বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলেম ড. ওয়াহবা আয্যুহায়লী 'আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লতুহু' তে ও ইবনে রুশদের অনুরূপ ইজমা নকল করেছেন। (আল ফিকহুল ইসলামী : ৩/১৬৫৮)

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য নয়, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ইজমার কথা যখন বর্ণনা হয়েছে এবং ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাজার ও ইমাম কাশ্মীরীর মত বিদগ্ধ উলামায়ে কেরামও ঐ ইজমাকে অস্বীকার করেননি বরং ইবনে তাইমিয়া তো বিভিন্ন স্থানে বারবার এ কথা বলেছেন যে, এটা ইবনে আব্দুল বারের বর্ণনা করা ইজমার খেলাফ না। সুতরাং বর্ণিত ইজমাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া প্রথম যুগের ইমামদের থেকে বর্ণিত মতামত হয়তো একাধিক রয়েছে অথবা মুজমাল (ব্যাখ্যা সাপেক্ষ)। সুতরাং সে মতের কারণে ইজমার উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। (মাআরেফুস সুনান:৫/৩৪৩)

যদিও মাসআলাটি মূলত মুজতাহিদ ফীহ হওয়ায় পরবর্তী উলামায়ে কেরাম মতানৈক্য ও ভিন্নভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

হানাফী মাযহাব: উদয়স্থলের বিভিন্নতার সূরতে চাঁদ প্রমাণিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আসহাবে মাযহাব অর্থাৎ ইমাম আবূ হানিফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. থেকে কোনো মতামত আমরা পাইনি। আর পরবর্তীদের মধ্যে দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

ক. ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হবে। সুতরাং এক দূরবর্তী দেশের চাঁদ দেখা অন্য দূরবর্তী দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, নিকটবর্তী দেশ হলে এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।

খ. ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ চন্দ্রের উদস্থলের পার্থক্য ধর্তব্য নয়। সুতরাং এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে অন্য অঞ্চলের জন্য তা গ্রহণযোগ্য হবে। এ মতটির প্রয়োগস্থল নিকটবর্তী এলাকা না দূরবর্তী এলাকা তা অস্পষ্ট এবং ব্যাখ্যাহীন।

দ্বিতীয় মতের আলোচনা ও তার ব্যাখ্যা পরে উল্লেখ করা হবে, প্রথমে প্রথম মতের স্বপক্ষে যেসব হানাফী উলামায়ে কেরাম মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের নাম ও কিতাবের হাওয়ালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ইমাম হুসামুদ্দীন শহীদ 'আলফাতাওয়াল কুবরা' (পৃ. ১৬)
২. ফকীহ আবুল ফাতাহ যহীরুদ্দীন আল ওয়ালওয়ালেজী 'আল ফাতাওয়া আলওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ (১/২৩৬) তে,
৩. আল্লামা কাসানী 'বাদায়েউস সানায়ে' (২/৫৭৯)
৪. আল্লামা আইনী 'শরহুল আইনি আলা কানযিদ্দাকায়েক' (১/১৩৮)
৫. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রশীদ কিরমানী 'জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া' (১/৩২ : ৩৩)
৬. মোল্লা আলী কারী 'ফাতহু বাবিল ইনায়া' (১/৫৬৫)
৭. ফকীহ্ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ শায়খী যাদা 'মাজমাউল আনহুর' (১/৩৫৩)
৮. ইমাম আব্দুল হাই লাখনাবী 'মাজমূআতুল ফাতাওয়া'-এর রুয়াতুল হেলাল অধ্যায় (উর্দূ ১/৩৪৪)
৯. ফকীহ আলী ইবনে উসমান 'আল ফাতাওয়াস সিরাজিয়্যাহ' (৩১পৃ)
১০. ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী 'তাবয়ীনুল হাকায়েক' (২/১৬৪)
১১. আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী 'ফাতহুল মুলহিম' (৩/১১৩)

১২. মুফতী শফী রহ. 'জাওয়াহেরুল ফিকহ' (৩/৪৩৯)
১৩. আল্লামা মুসিলী 'আল ইখতিয়ার' কিতাবে 'ফাতাওয়া হুসামিয়া' থেকে উক্ত মত বর্ণনা করেছেন। এবং তার নিজের রুজহানও সেদিকে হওয়া বুঝে আসে।
১৪. মক্কা-মদীনার উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়াও অনুরূপ। (ফাতাওয়া উলামাউল বালাদিল হারাম পৃ.৮৮৭)
১৫. 'মাজালিসে তাহকীকাতে শরইয়্যাহ নদওয়াতুল উলামা'-এর সিদ্ধান্তও এরূপ। (নাফায়িসুল ফিকহ:৩/১৪১)

আল্লামা ইবনুল হুমাম পূর্বে উল্লেখিত কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন: 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ হাদীসের অনুসরণ অধিকতর শ্রেয়, কারণ দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য কিনা এ ব্যাপারে এ হাদীসটি সুস্পষ্ট বর্ণনা। তাছাড়া এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদেরকে তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে। (ফাতহুল কদীর: ২/৩১৯)

আল্লামা কাসানী রহ. লিখেছেন: (এক শহরবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা পুরা করার সূরতে অপর শরহবাসী উনত্রিশ রোযা রাখলে একটি রোযা কাযা করবে।) 'এটা সে ক্ষেত্রে যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, উদয়স্থলের পার্থক্য না হয়। আর যদি অপর শহর দূরে হয়, তাহলে এক শহরবাসীর জন্য অন্য শহরের হুকুম আবশ্যক হবে না। কারণ শহর বা অঞ্চলের মাঝে অনেক দূরত্ব হলে উদয়স্থলও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের উদয়স্থলই ধর্তব্য হবে অন্যদেরটা নয়। (বাদায়েউস সানায়ে: ২/৫৭৯)

আল্লামা ফখরুদ্দীন যায়লায়ী লিখেছেন: 'দলীল প্রমাণের বিচারে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া। কারণ প্রত্যেক এলাকাবাসী তাদের অবস্থা হিসাবে সম্বোধিত বা দায়িত্ব প্রাপ্ত।' (তাবয়ীনুল হাকায়েক: ২/১৬৪)

মোল্লা আলী কারী রহ. লিখেছেন: ' দলীল প্রমাণের বিচারে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া।' (ফাতাহু বাবিল ইনায়াহ: ১/৫৬৭)

'ফাতাওয়া উলামায়ে বালাদে হারাম' গ্রন্থে উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণ করা হবে মতটি উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে: 'আর এই মতটিই শব্দ ও সঠিক গবেষণার বিচারে শক্তিশালী' (ফাতাওয়া উলামায়ে বালাদে হারাম পৃ.৮৮৯)

আবুল ফাতাহ ওয়াল ওয়ালেজী লিখেছেন : 'দুই দেশের উদয়স্থল যদি ভিন্ন হয়, তাহলে এক দেশের হুকুম অন্য দেশের জন্য আবশ্যক হবে না।' (আল ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালেজিয়াহ : ১/৩২৬)

দ্বিতীয় মতের বিচার বিশ্লেষণ : যেসব হানাফী উলামায়ে কেরাম দ্বিতীয় মত উল্লেখ করেছেন তাদের নাম ও কিতাবের নাম:

১. সাহেবে খুলাসাতুল ফাতাওয়া 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' (১/২৪৯)
২. আল্লামা কাযী খান 'ফাতাওয়া কাযীখান' (১/১৯৮)
৩. ফকীহ আলম উবনুল আলা 'তাতারখানিয়া' (৩/৩৬৫)
৪. ইবনে নুজাইম 'বাহরুর রায়েক' (২/৪৭১)
৫. আল্লামা বায্যাযী 'ফাতাওয়া বাযযায়িা' (১/৮৬)
৬. উমর ইবনে ইবরাহীম 'নাহরুল ফায়েক' (২/১৪)
৭. সাহেবে ফাতাওয়া হিন্দিয়া 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' (১/১৯৮)
৮. আল্লামা শামী 'ফাতাওয়ায়ে শামী' (২/৩৯৩)
৯. আশরাফ আলী থানভী রহ. 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' (২/১০৭)
১০. এবং ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম সহ আরো বিভিন্ন কিতাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না, এটাই জাহেরুর রেওয়ায়াহ। সুতরাং এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে অন্য অঞ্চলেও চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। নিকটবর্তী অঞ্চল ও দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারটি কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা' এ বিষয়টি মুজতাহিদ ফীহ এবং মুখতালাফ ফীহ ও বটে। 'ফাতাওয়া আল লাজনাতুত দায়িমায়' আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আব্দুররায্যাক আফীফী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুনি স্বাক্ষরিত ফাতাওয়াতে আছে: 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য না হওয়ার মাসআলাটি মাসায়েলে নাজরিয়্যাহ, এতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। আর এ মাসআলার ক্ষেত্রে মতের ভিন্নতা হয়েছে তাদের যাদের ইলম ও দ্বীনের ক্ষেত্রে আলাদা মর্যাদা রয়েছে। আর এটা ঐ সকল মাসায়েলের একটি যাতে ইজতিহাদ সঠিক হলে ডাবল সাওয়াব, আর ভুল হলে অর্ধেক সাওয়াব।' (প্রাগুক্ত : ১০/১০২)

সুতরাং এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইজতিহাদের যেমন সুযোগ রয়েছে তেমনি পরবর্তী ফকীহদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে কোনো একটি মত গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। আর মূলত এ মাসআলাটি তারজীহ বা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমল করার মত একটি মাসআলা। সুতরাং কোনো 'আসহাবে তারজীহ' যেকোনো মতকে দলীলের ভিত্তিতে তারজীহ অর্থাৎ প্রাধান্য দিতে পারেন।

শেষোক্ত উলামায়ে আহনাফের ইবারাতের বর্ণনা থেকে এ কথা প্রতিয়মাণ হয় যে, তারা উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এমতটিকে তারা জাহেরুল মাযহাব বলে দাবি করেছেন, আর জাহেরুল মাযহাব হওয়ার কারণেই এই মতটিকে তারা অন্য মতটির উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় হলো এই মতটি আসলেই জাহেরুল মাযহাব বা জাহেরুর রেওয়ায়াহ কিনা?

জাহেরুর রেওয়ায়াহ বা জাহেরুল মাযহাবের আলোচনাঃ

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন : 'জাহেরুর রেওয়ায়হ বলা হয় ঐ সকল মাসায়েলকে যেগুলো ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর কিতাব মাবসূত, যিয়াদাত, জামেয়ে সগীর, সিয়ারে সগীর, জামেয়ে কাবীর, ও সিয়ারে কাবীরে পাওয়া যায়। (উসূলুল ইফতা:১১৩, উকূদু রসমিল মুফতী:৭৩)

ইখতেলাফুল মাতালে মু'তাবার না। অর্থাৎ উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য হবে, এমন কোনো ফায়সালা আমরা জাহেরুর রেওয়ায়াহতে পাইনি (জাহেরুর রেওয়ায়াহ এর প্রায় সব কিতাবই খুঁজে দেখা হয়েছে)। ইমাম সারাখসী রহ. এর 'আল মাবসূত' যা জাহেরুর রেওয়ায়াহ' এর মাসআলা-মাসায়েলের সংক্ষিপ্ত সংকলন এবং 'কাফী'র ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেখানেও এরূপ কোনো কথা পাওয়া যায়নি। এমনকি নাদিরুর রেওয়ায়াতেও এমন কথা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি।

সুতরাং হানাফীদের কোনো গ্রন্থে 'ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার না' এটাকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ বলা এবং এ শুধু এ কারণে এই মতকে তারজীহ দেওয়ার ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখা উচিত। অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো একটি মাসআলা কারো দিকে নিসবত করা হয়, পরবর্তীরাও তার অনুসরণ করে নিজের কিতাবে তা উল্লেখ করে দেয়। কিন্তু আসল কিতাব পুনরায় নিরীক্ষণ করলে তা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. শরহু উকূদি রসমিল মুফতীতে এ বিষয়ে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। (শরহু উকূদি রসমিল মুফতী পৃ.৫৮)

এই মাসআলাটির উৎস:

নাদিরুর রেওয়ায়াহতে একটি মাসআলা পাওয়া যায় যার থেকে চাঁদের মাসআলাটি মুসতাম্বাত বা বের হতে পারে। আহকামুল কুরআনসহ কয়েকটি কিতাবে তার বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 'বিশর বিন ওয়ালীদ আবূ ইউসুফ রহ. থেকে এবং হিশাম মুহাম্মাদ রাহ., থেকে আমাদের আসহাবদের কারো মতোবিরোধ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন যে, যখন কোনো শরহবাসী চাঁদ দেখে উনত্রিশ দিন রোযা রাখে, আর ঐ শহরে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলো না, তার হুকুম হলো সুস্থ হওয়ার পর সে উনত্রিশটি রোযাই কাযা করবে। আর যদি কোনো অঞ্চলের লোক চাঁদ দেখে ত্রিশটি রোযা রাখে আর অপর অঞ্চলের লোকেরা চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রাখে তাহলে পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে বুঝে আসে যে, যারা উনত্রিশটি রোযা রেখেছে তাদের জন্য একটি রোযা কাযা করা জরুরী। আর ঐ শহরের অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ত্রিশটি রোযা কাযা করতে হবে। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস : ১/৩০৩)

ইমাম জাসসাস আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. থেকে যে দুইটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন সম্ভবত তার দ্বিতীয়টি থেকে ইখতেলাফে মাতালের মাসআলাটি ছাবেত করা হয়েছে। অর্থাৎ এক শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রাখল আর অপর শহরবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রাখল, তাহলে যে শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছে, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা একটি রোযা কাযা করবে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যে শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছে তাদের উপর ঐ শহরবাসী যারা চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রেখেছে তাদের চাঁদ দেখার কারণেই একটি রোযা কাযা করতে হবে। অতএব, এর দ্বারা বুঝা গেল অপর শহরবাসীর চাঁদ দেখা ধর্তব্য। ফলে ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার নয় সাব্যস্ত হলো অর্থাৎ উদয়স্থলের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

১. দ্বিতীয় মাসআলার ব্যাপারে ইমাম জাসসাস বলেছেন: 'পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে বুঝা যায় যে যারা উনত্রিশটি রোযা রেখেছে তারা একটি রোযা কাযা করবে।' এর দ্বারা বুঝা গেল দ্বিতীয় মাসআলাটি প্রথম মাসআলা থেকে ইস্তিম্বাত বা বের করা হয়েছে, এটি মানসূস আলাইহি কোনো মাসআলা না।

২. বর্ণিত মাসআলায় দুই শহরের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন নাকি এক, এ ব্যাপারে কোনো কিছুই উল্লেখ নাই। তাই এ মাসআলা থেকে ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার না, এ কথা প্রমাণ করা অসম্ভব।

৩. তাছাড়া এ মাসআলাটি 'মুহীতে বুরহানী' এবং 'তাতারখানিয়াতে' 'মুনতাকা'-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর মুনাতাকার ব্যাপারে কাশফুযযুনূর এর লেখক লিখেছেন: 'আল মুনতাকা ফী ফুরূইল হানাফিয়্যাহ হাকেম শহীদ রহ. এর লেখা। এতে মাযহাবের নাওয়াদিরুর রেওয়ায়হ সন্নিবেশিত হয়েছে।' (কাশফুয যুনূন:১৮৫১)

অতএব, যে বর্ণনার মধ্যে মাতালে বা উদয়স্থলের ভিন্নতা সত্ত্বেও চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার কোনো আলোচনাই নেই এবং যেটা নাদিরুর রেওয়ায়াহ সন্নিবেশিত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সেটাকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ বলা কি করে বৈধ হতে পারে?

তাই আমরা বলতে পারি যে, ইখতেলাফে মাতালে মু'তাবার না, এই মাসআলাটিকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ দাবি করে, জাহেরুর রেওয়ায়াহ হওয়ার কারণেই তারজীহ বা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, অথচ আমাদের আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, এই মতটিকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ দাবি করার কোনো কারণ নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আসহাবে মাযহাবের মতের ব্যাপারে আমরা তাই বলতে চাই যা ইউসুফ বান্নুরী রহ. বলেছেন। তিনি বলেন: 'প্রকাশ থাকে যে, মাযহাবের উলামাদের থেকে শুধু এতটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না। কাছের এলাকার বা দূরের এলাকার অথবা অন্যকোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া তাদের থেকে এই এজমালী কথা পাওয়া যায়... এ দিকে আমরা যখন জানতে পারলাম যে, দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং আইম্মা কেরামের মুতলাক (ব্যাখ্যা ছাড়া) কথাকে, নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য না, এরূপ শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা আবশ্যক। আমাদের শায়েখ আল্লামা কাশ্মীরী এটাই বলতে চেয়েছেন।' (মাআরিফুস সুনান:৫/৩৪১:৪২)

এখন আর হানাফীদের দুই প্রকার মতের ক্ষেত্রে কোনো সংঘর্ষ থাকল না। শুধু এতটুকু পার্থক্য থাকলো যে, একটি মত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, আরেকটি মত যেটির আলোচনা আমরা শেষে করেছি সেটি অস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মতটির ব্যাখ্যা করার পর প্রথম মতটির সাথে এর কোনো সংঘর্ষ বাকি থাকে না।

প্রিয় পাঠক! আশা করি আমাদের সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা পড়ার পর আপনার বুঝতে বাকী নেই যে, নিকটবর্তী এলাকার কোনো এলাকায় চাঁদ প্রমাণিত হলে তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে দূরবর্তী এলাকার হুকুম ভিন্ন। দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে এক অঞ্চল বা দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক দূরবর্তী এলাকা নিজেদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ পালন করবে। উল্লেখিত মাসআলাটি নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের একক সিদ্ধান্ত নয়। বরং মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এটিই। সুতরাং এ মাসআলার ব্যাপারে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। চৌদ্দশত বছর ধরে উম্মতের আমল যেভাবে চলে আসছে তাই সহীহ এবং দলীল প্রমাণ সমর্থিত আর ইজমাও এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মাসআলার বিরোধিতা করে নতুন কোনো আমল চালু করা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও কুরআন-সুন্নাহের বিরোধিতার নামান্তর।

সুতরাং আমাদের দেশের গুটিকয়েক বিদআতী ও ফেতনা সৃষ্টিকারী নামধারী আলেমদের কথা শুনে ও তাদের লেখা পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না। তাদের কথা অনুযায়ী সাউদী আরবের সাথে মিলিয়ে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং হেদায়াতের উপর কায়েম দায়েম রাখুন। আমীন।

দ্বিতীয় আমলঃ শাউয়াল মাসের রোযা

যে ব্যক্তি রমাযান মাসের রোযা পালনের পর শাউয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল।

প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শাউয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখে, সে যেনো পূর্ণ এক বছর (৩৬০ দিন) রোযা রাখার সমান সওয়াব লাভ করে। (মুসলিম ১১৬৪, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।)

এই সওয়াব এই জন্য যে, উম্মতে মুহাম্মাদির যে কেউ একটি ভালো কাজ করলে আল্লাহর অনুগ্রহে সে তার ১০ গুণ সওয়াব পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কেউ কোনো ভালো কাজ করলে সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে।" (সুরা আল-আন'আম, আয়াত ১৬০)
অতএব, এই ভিত্তিতে ৩০+৬ = ৩৬টি রোযা রাখলে ৩৬×১০ = ৩৬০ অর্থাৎ চন্দ্র মাস অনুযায়ী সারা বছর রোযা রাখার সমান সওয়াব পাওয়া যাবে।

আল্লামা ইবনে রজব রহ. বলেন, শাউয়াল মাসে রোযা রাখার তাৎপর্য অনেক। রমাযানের পর শাউয়ালে রোযা রাখা রমাযানের রোযা কবুল হওয়ার আলামত স্বরূপ। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার আমল কবুল করলে, তাকে পরেও অনুরূপ আমল করার তৌফিক দিয়ে থাকেন। নেক আমলের প্রতিদান বিভিন্নরূপ। তার মধ্যে একটি হলো পুনরায় নেক আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করা। তাই নামাজ রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বাকি এগার মাসেও চালু রাখা চাই। কেননা যিনি রমাযানের রব, বাকি এগার মাসের রব তিনিই।

তিনি আরো বলেন, তবে ইবাদতের মোকাবেলায় গুনাহের কাজ করলে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। অতএব, কোন ব্যক্তি রমাযানের পরপরই হারাম ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে, তার সিয়াম স্বীয় মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এবং রহমতের দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

গুনাহের পর ভাল কাজ করা কতইনা উৎকৃষ্ট আমল। কিন্তু তার চেয়ে আরো উৎকৃষ্ট আমল হলো নেক কাজের পর আরেকটি নেক কাজে মশগুল হওয়া। অতএব, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, যাতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত হকের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন। সাথে সাথে অন্তর বিপথে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ চাও। কেননা আনুগত্যের সম্মানের পর নাফরমানির বেইজ্জতি কতইনা নিকৃষ্ট।

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রমাযানের রোযা দশ মাসের রোযার সমতুল্য আর (শাওয়ালের) ছয় রোযা দু'মাসের রোযার সমান। সুতরাং এ হলো এক বছরের রোযা।

অপর রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা শেষ করে শাউয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখবে সেটা তার জন্য পুরো বছর রোযা রাখার সমতুল্য। (সূরা আন'আম আহমদ : ৫/২৮০, দারেমি : ১৭৫৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শাউয়াল মাসের ৬ রোযা রেখে সারা বছর রোযা রাখার সমান সাওয়াব পাওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

তৃতীয় আমলঃ শাউয়াল মাসে বিবাহ করা

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "বান্দা যখন বিবাহ করল তখন তার দ্বীনদারী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গেল। অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।" (মিশকাত শরীফ -২৬৭)

মানুষের অধিকাংশ গুনাহ দুটি কারণে সংঘটিত হয়। একটি হয় তার লজ্জা স্থানের চাহিদা পূরণের কারণে আর অন্যটি হয় পেটের চাহিদা পূরণের কারণে। বিবাহের কারণে মানুষ প্রথমটি থেকে হেফাজতের রাস্তা পেয়ে যায়। সুতরাং তাকে কেবল রিযিকের ব্যাপারে চিন্তান্বিত থাকতে হয়। যাতে করে সে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারে। একজন লোক খুব বড় আবেদ, তাহাজ্জুদ-চাশত-আওয়াবীন ইত্যাদি নফল নামায খুব পড়ে; কিন্তু সংসারের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই। আরেকজন লোক ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করে এবং বিবি বাচ্চার হক আদায়ে তৎপর থাকে ফলে তার বেশী বেশী নফল পড়ার কোন সময় হয় না। এতদসত্ত্বেও শরী'আত কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই ইবাদাতগুজার হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মুতাবিক বিবাহ-শাদী করে পরিবারের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হালাল রিযিকের ফিকির করছে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল যে চব্বিশ ঘণ্টা মসজিদে পড়ে থাকে বা বনে জঙ্গলে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে আর সব রকমের সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকে।

বিবাহের অন্যতম আরো একটি ফায়দা হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালন করা হয়। কেননা, তিনি ইরশাদ করেছেনঃ "বিবাহ করা আমার সুন্নাত।" আরেক হাদীসে এসেছেঃ" তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা বিবাহ কর। কারণ এর দ্বারা দৃষ্টি ও লজ্জা স্থানের হেফাজত হয়।" (মিশকাত শরীফ- ২৬৭ পৃঃ)

এছাড়াও বিবাহের দ্বারা মানুষ নিজেকে অনেক গুনাহের কাজ থেকে বাঁচাতে পারে। নেক আওলাদ হাসিল করতে পারে। আর নেক আওলাদ এমন এক সম্পদ যা মৃত্যুর পরে কঠিন অবস্থার উত্তরণে পরম সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়। কারো যদি নেক সন্তান থাকে তাহলে তারা যত নেক আমল করবে, সেগুলো পিতা-মাতার আমলে যোগ দেয়া হবে। বিবাহ-শাদী যেহেতু শরী'আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি ইবাদত, সেহেতু এর মধ্যে কোনভাবে গুনাহ এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কোন সংমিশ্রণ না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া এতে বেপর্দা, নাচ-গান, অপব্যয়-অপচয়, ছবি তোলা, নাজায়িয দাবী-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে দুরে থাকতে হবে। নতুবা মুবারক বিবাহের সমস্ত বরকতই নষ্ট হয়ে যাবে এবং স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সূচনাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। (মিশকাত শরীফ- ২/২৬৮)

বিবাহ সম্পর্কিত কিছু হাদীস

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ পাক আবশ্যক মনে করেন -

(১) ঐ মুকাতাব বা দাস যে নিজের মুক্তিপণ আদায় করতে চায়।

(২) ঐ বিবাহকারী যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং

(৩) ঐ মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (তিরমিযী শরীফ, মিশকাত-২৬৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার আভিজাত্যের কারণে বিবাহ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অপমান ও অপদস্থতা অধিক হারে বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের কারণে তাকে বিবাহ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দারিদ্রতাকে (দিনে দিনে) বৃদ্ধি করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করবে তার বংশ কৌলীন্য দেখে, আল্লাহ তা'আলা তার তুচ্ছতা ও হেয়তা বাড়িয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে শুধুমাত্র এই জন্য বিবাহ করে যে, সে তার চক্ষুকে অবনত রাখবে এবং লজ্জা স্থানকে হেফাজত করবে অথবা (আত্মীয়দের মধ্যে হলে) আত্মীয়তা রক্ষা করবে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেই নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনেই বরকত দান করবেন। (তাবারানী)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নারীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে (২) তার বংশ মর্যাদার কারণে (৩) তার সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দ্বীনদারীর কারণে। সুতরাং তুমি দ্বীনদার বিবি লাভ করে কামিয়াব হও। তোমাদের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও (যদি দ্বীনদার ব্যতীত অন্য নারী চাও)। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-২৬৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল নেককার বিবি। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত- ২৬৭)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের নিকট এমন কোন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দ্বীনদারী ও আখলাক তোমরা পছন্দ কর, তখন বিবাহ দিয়ে দাও। (মাল সম্পদের প্রতি লক্ষ্য কর না) তা যদি না কর তাহলে দেশে ব্যাপকহারে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। (তিরমিযী, মিশকাত শরীফ- ২৬৭)

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ সর্বাপেক্ষা বরকতর্পূণ বিবাহ হলো, যা সর্বাপেক্ষা কম খরচে সম্পাদিত হয়। (বাইহাকী, মিশকাত শরীফ- ২৬৮)

বিবাহের স্থান ও কাল

বিবাহের জন্য উত্তম হলো জুমু‘আর দিন। পঞ্জিকায় যে শুভ অশুভ সময় লেখা আছে, সেটা হিন্দুদের তরীকা। শরী‘আতের দৃষ্টিতে যে কোন মাসে, যে কোন দিনে এবং যে কোন সময়ে বিবাহ বৈধ। তবে শাউয়াল মাসে এবং জুম‘আর দিনে বিবাহ করা সুন্নাত। (ফাতাওয়া শামী-৩/৮)

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মুসলমানদের বিবাহ মসজিদেই সম্পন্ন হত। আর এটা নবীজীর সুন্নাতও বটে। শাউয়াল মাসে বিবাহ করা আরেকটি সুন্নাত। সুতরাং কারো পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে সে শাউয়াল মাসের জুমু‘আর দিনে বিবাহ করবে। আর সম্ভব না হলে অন্য যে কোন সময়ে করতে পারে। তবে সম্ভব হলে মসজিদ ও জুমু’আ ঠিক রাখবে, এটাও সম্ভব না হলে দুটোর কোন একটা ঠিক রাখতে চেষ্টা করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ খায়ের ও বরকত থেকে মাহরুম হবে না।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদের বিবাহে সুবিধা হলো, এতে কোন ফালতু খরচ হয় না। বিছানা-পত্র এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দাবী-দাওয়ার সুযোগ থাকে না। কেননা, মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের জায়গা, সেখানে মানুষ ইবাদত করতে আসে। আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করতে আসে। কাজ শেষ হলেই চলে যায়। (মিশকাত শরীফ -২/২৭১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৩/২৬৫)

বিবাহ-শাদীর প্রচলিত ভুলসমূহ

বিবাহ-শাদী মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা মহান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষ নে‘আমত হিসাবে দান করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিবাহ-শাদী দুনিয়াবী কাজ বা মুবাহ মনে হলেও যথা নিয়মে সুন্নাত তরীকায় যদি তা সম্পাদন করা হয় তাহলে সেটা বরকতপূর্ণ ইবাদত ও অনেকে সওয়াবের কাজ হয়। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিবাহ-শাদী সুন্নত তরীকায় তো হয়ই না। উপরন্তু এটা বিভিন্ন ধরনের কুপ্রথা এবং বড় বড় অনেক গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে চলছে। এজন্য নিম্নে বিবাহ-শাদী সম্পর্কিত কিছু ভুল এবং কুপ্রথা তুলে ধারা হল। যাতে এগুলো থেকে বাঁচা হয়।

বিবাহের পূর্বের ভুলসমূহ

১. বিবাহ শাদী যেহেতু ইবাদত, সুতরাং এখানে দীনদারীকে প্রাধান্য দিতে হবে। দুনিয়াদারগণ সৌন্দর্য, মাল, দৌলত ও খান্দানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এটা রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত হওয়ায় শান্তি বয়ে আনে না।

২. কোন কোন জায়গায় অভিভাবক এবং সাক্ষী ছাড়া শুধু বর কনের পরস্পরের সন্তুষ্টিতেই বিবাহের প্রচলন আছে। অথচ এভাবে বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না। বরং এটি যিনা-ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও যদি মেয়ে পক্ষের অভিভাবকের সম্মতি না থাকে, আর ছেলে সে মেয়ের “কুফু” তথা দীনদারী মালদারী ও পেশাগত দিক থেকে সামঞ্জস্যশীল না হয় তাহলে সে বিবাহও শুদ্ধ হয় না।

৩. কেউ কেউ ধারণা করে যে মাসিক চলাকালীন সময় বিবাহ শুদ্ধ হয় না। অথচ এ অবস্থায়ও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এ অবস্থায় সহবাস জায়িয নেই।

৪. কেউ কেউ ধারণা করে যে মুরীদনীর সাথে পীর সাহেবের বিবাহ জায়িয নেই। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ সকলেই তাঁর মুরীদনী ছিলেন।

৫. অনেকে অনেক বয়স হওয়ার পরও বিবাহ করে না কিংবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর বা সে মৃত্যু বরণ করার পর আর ২য় বিবাহ করে না। অথচ শারীরিক বিবেচনায় তার বিবাহ করা জরুরী ছিল। এ অবস্থায় থাকা মানে যিনা-ব্যভিচারে জড়িত হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়া।

৬. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় (উদাহরণ স্বরূপ) ৬০ বছরের বয়স্ক লোক অল্প বয়সী যুবতী মেয়েকে বিবাহ করে বসে। ফলে ঐ মেয়ে নিশ্চিত জুলুমের শিকার হয়।

৭. অনেকে স্ত্রীর খেদমতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দুর্বলতা লুকিয়ে লোক দেখানোর জন্য বিয়ে করে স্ত্রীর জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এটা মারাত্মক গুনাহের কাজ।

৮. কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত লোক আধুনিক শিক্ষা তথা ডাক্তারি প্রফেসারি ইত্যাদি ডিগ্রি দেখে মেয়ে বিয়ে করে। তাদের ভাবা উচিৎ বিয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য কী? যদি তার স্ত্রীর দ্বারা টাকা কামানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা তো বড় লজ্জাজনক কথা যে, পুরুষ হয়ে মহিলাদের কামাইয়ের আশায় বসে থাকবে। মনে রাখতে হবে এধরণের পরিবারে শান্তি আসে না।

৯. কেউ কেউ পালক পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রী বিবাহ করাকে না জায়িয মনে করে। এটা জাহিলী যুগের বদ-রসম।

১০. কেউ কেউ বিধবা মহিলাদের বিবাহ করাকে অপছন্দ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ স্ত্রী বিধবা ছিলেন। (বুখারী হাঃ নং ৫০৭৭)

বিবাহের সময়ের ভুলসমূহ

বর পক্ষের ভুলসমূহ

১. বিবাহ শাদী যেহেতু ইবাদত, সুতরাং বিবাহকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার গুনাহ না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে খায়ের বরকত লাভ হবে। যদি বিবাহকে গুনাহ মুক্ত করা না যায় তাহলে সেখানে অশান্তি হওয়া নিশ্চিত। ২. প্রথাগতভাবে অনেক লোকের বর যাত্রী হিসেবে যাওয়া। ৩. দাওয়াতকৃত সংখ্যার অধিক লোক নিয়ে যাওয়া। ৪. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কন্যার জন্য যৌতুক পাঠানো এবং এটাকে জরুরী মনে করা। ৫. গায়রে মাহরাম পুরুষ দ্বারা মেয়ের ইজন বা অনুমতি আনা। ৬. বেগানা পুরুষদের কন্যার মুখ দেখা এবং দেখানো। ৭. নাচ-গান, বাজনা ইত্যাদি করা। ৮. সালামী গ্রহণ করা। ৯. মোহরানা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূর্বেই না করা, বরং করাকে দোষ মনে করা। অতঃপর বিবাহের সময় তর্ক-বিতর্ক করা। ১০. লোক দেখানোর জন্য বা গর্বের সাথে ওলীমা করা। ১১. মোহরানার বিষয়ে গুরুত্ব না দেয়া এবং মোহরানা আদায়ে গাফলতী করা। ১২. ইচ্ছাকৃত এমন কর্মকাণ্ড করা যে কারণে কোন পক্ষের অদূরদর্শিতা প্রমাণিত হয় অথবা তাদের অস্থিরতার কারণ হয়। আর নিজেদের সুনাম প্রকাশ পায়। ১৩. বিবাহ অনুষ্ঠানের কারণে ফরয ওয়াজিবসহ শরী‘আতের বিধানের ব্যাপারে উদাসীনতা এবং অনীহা প্রকাশ করা।

কন্যা পক্ষের ভুলসমূহ

১. বর যাত্রার চাহিদা। ২. ছেলের জন্য উপঢৌকন/যৌতুক প্রকাশ্যে পাঠানো, পাঠানোকে পছন্দ করা এবং জরুরী মনে করা। ৩. আত্মীয়-স্বজন মহল্লাবাসীদের জন্য প্রথাগত দাওয়াত এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা। ৪. বিবাহের সরঞ্জাম, অলংকারাদী প্রকাশ্যে দেখা এবং অন্যদেরকে দেখানো। ৫. বিবাহের পর রসম হিসাবে জামাতাকে শরবত পান করানো। ৬. বেগানা মহিলারা জামাতার সামনে আসা। ৭. সালামী গ্রহণ করা। এটাকে জরুরী মনে করা এবং নেয়া দেয়া। ৮. যাতে মহল্লায় খুব প্রসিদ্ধ হয় সে জন্যে ইচ্ছাকৃত কোন কিছু করা। ৯. ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন হওয়া। এছাড়াও বিবাহ উপলক্ষে অনেক বেপর্দা, যুবক যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা, অপব্যয়, ছবি এবং ভিডিও ইত্যাদি করা হয়, যাতে বিবাহের সকল খায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

বিবাহের কিছু কুপ্রথা

১. মেয়ের ইযিন আনার জন্য ছেলেপক্ষ স্বাক্ষী পাঠিয়ে থাকে, শরী‘আতের দৃষ্টিতে এর কোন প্রয়োজন নেই।

২. বিবাহের সময় অনেকে বর-কনের দ্বারা তিনবার করে ইজাব কবূল পাঠ করিয়ে থাকে এবং পরে তাদের দ্বারা আমীন বলানো হয়। শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

৩. ইজাব কবূলের মাধ্যমে আকদ সম্পাদন হওয়ার পর মজলিসে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে সামনে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে বর যে সালাম করে থাকে তারও কোন ভিত্তি নেই।

৪. ঝগড়া-ফাসাদের আশংকা থাকা সত্ত্বেও খেজুর ছিটানোকে জরুরী মনে করা হয়। অথচ এ সম্পর্কিত হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম যঈফ বলেছেন।

বিবাহ শাদীর আরো কতিপয় কুসংস্কার

১. অনেক জায়গায় বিবাহ রওয়ানা হওয়ার আগে এলাকার প্রসিদ্ধ মাযার যিয়ারত করে তারপর রওয়ানা হয়। শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

২. বরের নিকট কনে পক্ষের লোকেরা হাত ধোয়ানোর টাকা, পান পাত্রের পানের সাথে টাকা দিয়ে তার থেকে কয়েকগুণ বেশী টাকা জোর যবরদস্তী করে আদায় করে থাকে। এটা না জায়িয।

৩. অনেক জায়গায় গেট সাজিয়ে সেখানে বরকে আটকে দেয়া হয় এবং টাকা না দেয়া পর্যন্ত ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। এটাও একটা গর্হিত কাজ।

৪. খাওয়া দাওয়া শেষে কনে পক্ষের লোকেরা বরের হাত ধোয়ায়। পরে হাত ধোয়ানো বাবদ টাকা দাবী করে। অনেক জায়গায় এ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। এটা একেবারেই অনুচিত। মূলতঃ এসব হিন্দুয়ানী প্রথা। দীর্ঘ দিন যাবত হিন্দুদের সাথে বসবাস করার কারণে আমাদের মধ্যে এই কুসংস্কারগুলি অনুপ্রবেশ করেছে।

৫. বিবাহ পড়ানোর আগে বা পরে যৌতুকের বিভিন্ন জিনিস-পত্র প্রকাশ্য মজলিসে সকলের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এটাও অন্যায় ও নির্লজ্জতার কাজ।

৬. বিবাহের পরে নারী-পুরুষ সকলের সামনে কনের পিতা বা মাতা জামাই-মেয়ের হাত একসাথে করে তাদেরকে দু‘আ দেয়। কনের পিতা জামাইকে বলে “আমার মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম, তুমি এক দেখে শুনে রেখ” এর কোন ভিত্তি শরী‘আতে নেই।

৭. বিবাহ করে আনার পর শ্বশুর বাড়ীতে নববধূকে বিভিন্ন কায়দায় বরণ করা হয়। কোথাও ধান, দুবলা ঘাস, দুধের স্বর ইত্যাদি দিয়ে বরণ করা হয় এবং নববধূর চেহারা সকলকে দেখানো হয়; এসবই হিন্দুয়ানী প্রথা। কোন মুসলমানের জন্য এসব করা জায়িয নেই।

৮. অনেক জায়গায় মেয়ের বিয়ের আগের দিন আর কোথাও মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পরের দিন মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের বাড়ীতে মাছ-মিষ্টি ইত্যাদি পাঠানো হয়ে থাকে। কোথাও এটাকে চৌথি বলা হয়। এটাও বিজাতীয় নাজায়িয প্রথা।

৯. বর বা কনেকে কোলে করে গাড়ী বা পালকী থেকে নামিয়ে ঘরে তোলাও চরম অভদ্রতা বৈই কিছু নয়।

১০. ঈদের সময় বা অন্য কোন মৌসুমে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে চাল, আটা, ময়দা, পিঠা ইত্যাদি পাঠানো এবং এ প্রচলনকে জরুরী মনে করার প্রথা অনেক জায়গায় চালু আছে। আবার অনেক জায়গায় আনুষ্ঠানিকভাবে জামাইকে এবং তার ভাই-বোনদেরকে কাপড়-চোপড় দেয়ার প্রথা আছে। এমনকি এটাকে এতটাই জরুরী মনে করা হয় যে, ঋণ করে হলেও তা দিতে হয়। এটা শরী'আতের সীমালঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু নয়।

১১. আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠানে বেগানা মহিলাদের সাজ-সজ্জা করে নিজেকে বিকশিত করে একত্রিত হতে দেখা যায় এবং যুবক যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা করতেও দেখা যায়। এধরনের বেপর্দা আর বেহায়াপনার কারণে উক্ত মজলিসে উপস্থিত নারী পুরুষ সকলেই গুনাহগার হবে।

১২. বিবাহ উপলক্ষে গান-বাজনা, ভিডিও, ভিসিআর ইত্যাদি মহামারী আকার ধারণ করেছে। আর কোন কোন এলাকায় তো যুবতী তরুণী মেয়েরা একত্রিত হয়ে নাচ গানও করে থাকে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এসব হারাম ও নাজায়িয।

১৩. আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠান মানেই গুনাহের ছড়াছড়ি। এমন এমন গুনাহ সেখানে সংঘটিত হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছবি তোলা ও ভিডিও করা। শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন প্রাণীর ছবি তোলা চাই ক্যামেরার মাধ্যমে হোক কিংবা ভিডিও এর মাধ্যমে হোক বা অংকন করা হোক সবই হারাম।

১৪. বিবাহের পরে মেয়েকে উঠিয়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে মেয়ের বাড়ীতে পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা একত্রিত হয়, আর বরকে অন্দর মহলে এনে সকলে মিলে হৈ হুল্লা করে তার মুখ দর্শন করে। মেয়েরা হাসি মজাক করে বিভিন্ন উপায়ে নতুন দুলাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে। আর নির্লজ্জ হাসি তামাশায় মেতে উঠে। এধরনের বেপর্দেগী শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।

১৫. অনেক জায়গায় প্রথা চালু আছে যে, নববধূকে বর নিজে বা তার ভগ্নীপতি অথবা তার ছোট ভাই পালকী বা গাড়ী থেকে নামিয়ে কোলে করে ঘরে নেয়। তারপর উপস্থিত মহল্লাবাসীর সামনে নববধূর মুখ খুলে দেখানো হয়। এ সকল কাজ হারাম এবং নাজায়েয।

বিবাহের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন হযরত মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের (দা.বা.) "ইসলামী বিবাহ" কিতাবটি।

বি.দ্র. কেউ যদি শাউয়াল মাসের নিকটবর্তী সময়ে বিবাহ করার জন্য তৈরী থাকে তবে তার জন্য পারমর্শ হলো সে যেন শাউয়াল মাসের অপেক্ষা করে কিন্তু কারো বিবাহ যদি ২/৩ মাস আগে বা পরে ঠিক হয় তবে তার জন্য শাউয়াল মাস অপেক্ষা না করে তাৎক্ষনিক বিবাহ করা উচিত।

চতুর্থ আমলঃ শাউয়াল মাসে হাজ্জের প্রস্তুতি

এই মাসের আরেকটি আমল বা কাজ হলো হজ্জের প্রস্তুতি নেয়া। হজ্জের জন্য যারা নিয়ত করেছে তাদের কাজ হলো তারা যেন হজ্জের যাবতীয় মাসআলা মাসাইল শিক্ষা করে।

হজ্জের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন হযরত মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের (দা.বা.) "কিতাবুল হাজ্জ" কিতাবটি।

শাউয়াল মাসের শিক্ষাঃ সুহবাত

শাউয়াল মাসের শিক্ষা হলো সুহবাত। রমাযান মাসের সুহবাতের কারণে শা'বান মাস এবং এই শাউয়াল মাস এতো দামী হয়েছে। সুহবাতের কারণে এই মাসকে "শাউওয়ালুল মুকাররম" বলা হয়। ঠিক তেমনি নেক লোকের সুহবাতের কারণেই মানুষও দামী হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সংসর্গে থাকো। (সূরা তওবা, আয়াত ১১৯, পারা ১১)

হযরত হানযালা রাযি. (একটি দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেন, আমরা যখন আপনার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র খেদমত হতে চলে আসি, তখন পরিবার-পরিজন, কাজ-কারবার ও সম্পত্তির মধ্যে ডুবে যাই এবং অনেক বিষয়ের খেয়ালও থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সেই সত্ত্বার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। যে অবস্থায় তোমরা আমার নিকট থাকো, যদি এই অবস্থা বা যিকিরে নিমগ্নতা স্থায়ী হয়, তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের সাথে তোমাদের বিছানায় এবং পথে মুসাফাহা করতে থাকবে। কিন্তু হে হানযালা! কেমন একেকটি মুহূর্ত! কেমন একেকটি মুহূর্ত! তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন।' (মুসলিম-৭১৪২ ও তিরমিযী)

সাহাবায়ে কেরাম সকলেই আলেম ছিলেন না, কিন্তু (সাধারন সাহাবীর মর্যাদাও সর্বোচ্চ শ্রেনীর মুহাদ্দেস, ফকীহ এবং বড় বড় ওলী-কুতুবের উপর স্বীকৃত। এই মর্যাদা নির্ভর করে একমাত্র নবীজীর সাহচর্য ও সান্নিধ্যের উপর) তাঁরা যা কিছু লাভ করেছেন, তা শুধু মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসর্গের মাধ্যমেই পেয়েছেন। আল্লাহ্ওয়ালাগণ সদা-সর্বদা সুহবত বা সাহচর্যকে অবশ্য করণীয় কর্তব্য মনে করেছেন। তাঁরা ইলমের প্রতি এতো মনোযোগ দেননি যতটুকু মনোযোগ দিয়েছেন সংসর্গের প্রতি।

অনেক এলেমওয়ালা লোক কোন বড় আল্লাহর ওলীর সুহবাতে যায়নি তো তিনিও গোমরাহ হয়েছেন বা দ্বীনের খেদমতে তেমন আঞ্জাম দিতে পারেন নি। অপরদিকে সাধারন লোক বড় আল্লাহর ওলীর সুহবাতে গিয়ে এমন দামী হয়েছেন যে পরবর্তীতে বড় বড় আলেম উনার সুহবাতে থাকতে পারা সৌভাগ্য মনে করেছেন। যেমন বর্তমানে (১৪৩৭ হিঃ) পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আলেম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এবং পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা দারুল উলুম করাচীর মুহতামিম সাহেব মুফতী রাফী উসমানী দা.বা., উভয়েই যার সুহবাতকে সৌভাগ্যের আলামত ভেবেছেন তিনি ছিলেন একজন সাধারন লোক। নাম, ডাঃ আব্দুল হাই রহ.। এই ডাঃ আব্দুল হাই রহ., গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সুহবাতে থেকে নিজেকে এত দামী বানিয়েছিলেন। সারা দুনিয়ার সমস্ত আলেম উনাকে ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী হিসেবে জানেন। সুহবাতের বরকতে তিনি আরিফ বিল্লাহ হিসেবে খ্যাত। এমন বহু মানুষ সুহবাতের মাধ্যমে দামী হয়েছেন এবং হচ্ছেন। হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বলেন, “সঙ্গ গুণে রঙ্গ আসে।” তাই আমাদের জন্য জরুরী হলো নেক লোকের সুহবাতকে গণিমত মনে করে তাদের সাথে উঠাবসা করা।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন